আশ্রয়হারা পরিবারগুলো কোথায় যাবে

রিপোর্ট : **বদরুল আলম নাবিল**

সিরাজগঞ্জ শহর থেকে আমরা উপজেলা শহর কাজিপুরের দিকে রওনা হয়েছিলাম। সীমান্ত বাজারের বেশ কিছুটা আগে আমাদের গাড়ি রেখে উঠতে হলো নৌকায়। নৌকা ছেড়ে আবার রিকশা, রিকশা ছেড়ে নৌকা, নৌকা থেকে নসিমন, এভাবে কয়েকবার পাল্টাপাল্টি করে কাজিপুর উপজেলা অফিসে পৌছতে পেরেছিলাম। আমরা যে রাস্তাটি দিয়ে কাজিপুর যাচ্ছিলাম এটি সিরাজগঞ্জ সদরের সঙ্গে কাজিপুরের সংযোগ রক্ষাকারী একমাত্র পাকা রাস্তা। রাস্তার অবস্থা দেখে মনে হয় বর্ষা শুরু হওয়ার আগে আগে রাস্তাটি মেরামত করা হয়েছে। এই সুন্দর রাস্তাটি সাম্প্রতিক বাঁধভাঙা বন্যার পানির তোড়ে বেশ কিছু স্থানে ভেঙে গভীর খাল হয়ে গেছে।

সীমান্ত বাজারের পর থেকে দেখলাম আরেক দৃশ্য। রাস্তার দুই ধারে সহস্রাধিক পরিবার অস্থায়ী খুপরিঘর তৈরি করে বসবাস শুরু করেছে। দুই দিকে খুপরি ঘর ওঠায় মাঝারি ধরনের রাস্তাটির চলাচলের পথ এতোটাই সরু হয়ে গেছে যে ২টি রিকশা ক্রস করতে পারে না।

এ রাস্তার খুপরিতে উঠে আসা একজন আকলিমা। আকলিমার স্বামী আব্দুর রহিম রিকশা চালাতে গেছে। আকলিমা মাটির চুলায় আধাভিজা কাঠ দিয়ে রান্না করতে চেষ্টা করছে। চুলায় আগুন নেই কিন্তু ধোঁয়ায় চারপাশ আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। আগুন ধরানোর জন্য ফুঁ দিতে দিতে আকলিমার দু'চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। তার তিন শিশু সন্তান এর বড় দু'টি গেছে বড়শি দিয়ে মাছ ধরতে। ছোটটি খুপরির ভেতরে চিৎকার করছে কাঁদছে। সেদিকে তাকানোর সময় নেই আকলিমার।

আকলিমার বাড়ি ছিল রতনকান্দি বাজারের কাছে। স্বামী ভূমিহীন কিন্তু আকলিমা পৈত্রিক সূত্রে বিঘা দুয়েক জমি পেয়েছে। তা চাষ করে তাদের সংসার এক রকম চলে যেতো। কিছু জমিতে ধান, কিছুতে আখের চাষ করত উদয় অস্ত খেটে স্বামী আব্দুর রহিম। কিন্তু গত জুলাইয়ের বাঁধ ভাঙা বন্যার পানি ভাসিয়ে নিয়ে গেছে তার বাড়িঘর। ধান আখের খেতের ওপার ২-৩ ফুট উঁচু বালির আস্তরণ পড়ে গেছে। সংসারের তেমন কিছু সরাতে পারেননি। আকলিমার শখের হাঁস মুরগিগুলো ভেসে গেছে। কিছু হাঁড়ি পাতিল আর ঘরে দুটি চালা নিয়ে অনেক কষ্টে উঠে এসেছেন এই উঁচু রাস্তায়। অনেক সংগ্রাম করে এখানে বেঁচে আছেন। বৃষ্টি হলে খুপরির ভেতরে পানি পড়ে ভিজে যায়। সারা রাত নির্ঘুম শিশু সন্তানগুলোকে বুকে চেপে বসে থাকতে হয়। রিকশা চালিয়ে রহিম যা আয় করেন তাতে ৫টি পেটের খোরাক হয় না। নিজে না খেয়ে সন্তান ও স্বামীর মুখে আহার তুলে দিচ্ছেন আকলিমা। অর্ধহার অনাহারে আর দুশ্চিন্তায় আকলিমার কালো শরীরটা কাঠির মতো হয়ে গেছে।

আকলিমা রহিমের মতো সহস্রাধিক আশ্রয়হারা পরিবার খুপরি পেতে আছে সীমান্ত বাজার থেকে ধুবলাই পর্যন্ত দীর্ঘ এই রাস্তায়। সবারই গল্প প্রায় একই রকম।

স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ থেকে একবার ৫ কেজি করে চাল দেয়া হয়েছে। এনজিওদের মধ্যে কেয়ার, ব্র্যাক, কারিতাস, সার্ফ এবং জিকেএস একবার করে ত্রাণ দিয়েছে। বন্যাকালীন এই ত্রাণই আশ্রয়হারা মানুষগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। বন্যায় পানি নেমে যাওয়ার পর ত্রাণ আসা কমে গেছে। সরকারি ভিজিএফ এখনো চালু হয়নি। ফলে আশ্রয়হারা মানুষ বেঁচে থাকার জন্য যে যেভাবে পারছে কিছু আয় রোজগার

করতে নেমে পড়ছে।

কাজিপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শহিদুজ্জামান ফারুকী সাপ্তাহিক ২০০০কে জানিয়েছেন, 'বন্যার সময়ে এই রাস্তায় ৬-৭ হাজার পরিবার আশ্রয় নিয়েছিল। পানি নামার পর যাদের যাওয়ার জায়গা ছিল তারা চলে গেছে। যাদের জমি জমা নেই অথবা যেখানে বাড়ি ছিল এখন সেখানে বন্যার পানির তোড়ে খাল হয়ে গেছে তারা এখনো রাস্তায় আছে। এদের পুনর্বাসন করার একটি প্রস্তাব জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে।'

সীমান্ত বাজার এলাকার পাকা রাস্তায় যে পরিমাণ আশ্রয়হারা মানুষ অবস্থান নিয়েছে তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি পরিবার আশ্রয় নিয়েছে রতনকান্দি হাটের কাছের পিলগাছা এবং গজারিয়ার ওপর বেড়িবাঁধে। সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার খলিল আহমেদ ২০০০কে জানিয়েছেন, 'এই বেড়িবাঁধটি সদর উপজেলা এরিয়ায় হলেও এই বাঁধে আশ্রয় নেয়া পরিবারগুলো কাজিপুর উপজেলা শুভগাছা ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের।'

উল্লেখ্য, শুভগাছা ইউনিয়নের ১০টি গ্রাম এই বন্যায় একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। যেখানে বাড়িঘর, ধানক্ষেত, খেলার মাঠ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বাজার ছিল সেখানে এখন গভীর খাল। এই ইউনিয়নের হাজার হাজার পরিবার বিভিন্ন স্থানে বাঁধের ওপরে আশ্রয় নিয়েছে। এদেরই একটি বড় অংশ আশ্রয় নিয়েছে রতনকান্দি, পিলগাছা-গজারিয়া অংশের এই বেড়িবাঁধে।

ট্রলার নিয়ে আমরা এই বেড়িবাঁধে গেলে আশ্রয়হারা কয়েকশ' নারী-পুরুষ এবং শিশু নদীর তীরে এসে দাঁড়ায়। তারা মনে করেছিল ট্রলারে করে তাদের জন্য খাবার নিয়ে এসেছি আমরা। সাংবাদিক পরিচয় পাওয়ার পর কেউ হতাশ হলো, কেউ আবার এগিয়ে এসে নিজেদের দুর্দশার কথা বলতে শুরু করলো। ১০-১২ জন একত্রে যার যার কথা বলতে শুরু করলো কিন্তু কারো কথাই আমরা বুঝতে পারছিলাম না। মাঝ বয়সী লাকী খাতুন জানালেন, তার বাড়ি ছিল শুভগাছা ইউনিয়নের বিটপাড়া গ্রামে। সে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ৩ সের চাল পেয়েছে একবার। এছাড়া এনজিও কারিতাস ১৫ কেজি করে চাল দিয়েছে।

বৃদ্ধ শাহজাহান মিয়া বললেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা একবার এসে কিছু ত্রাণ দিয়ে গেছে।

রতনকান্দি বাঁধে ১১২টি পরিবার আশ্রয় নিয়েছে। এছাড়া অন্যান্য বাঁধে আরো হাজার হাজার পরিবার মানবেতর জীবন যাপন করছে। বন্যায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত শুভগাছা ইউপি চেয়ারম্যান নাছির উদ্দিন রতন বন্যার্তদের খোঁজখবর নেন না- এরকম অভিযোগ ক্ষতিগ্রস্তদের। কিন্তু এই অভিযোগ সম্পর্কে জানতে গিয়ে আমরা যা দেখলাম তারপর এই প্রশ্ন আর মনে আসেনি।

> আকলিমা রহিমের মতো সহস্রাধিক আশ্রয়হারা পরিবার খুপরি পেতে আছে সীমান্ত বাজার থেকে ধুবলাই পর্যন্ত দীর্ঘ এই রাস্তায়। সবারই গল্প প্রায় একই রকম।

শুভগাছা ইউনিয়ন পরিষদে নবনির্মিত দ্বিতল ভবনে গাদাগাদি আশ্রয় নিয়েছে ৪৮টি পরিবার। এদের মধ্যে একটি পরিবার চেয়ারম্যানের নিজের, বাকিগুলো তার বংশের অন্যান্য পরিবার। তিনি আমাদের জানালেন, 'তার বাড়িসহ তার বংশের ৪৮টি পরিবারের ঘরবাড়ি বন্যায় পুরোপুরি ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। ইউনিয়ন পরিষদ ভবনটি ছিল বলে বেঁচে গেছি না হলে কোথায় যেতাম বলতে পারি না।' নিজে যেখানে সব হারিয়ে উদ্বাস্তু তার কাছে অন্যদের খবর জিজ্ঞেস করা অমানবিক। তারপরও যখন জিজ্ঞেস করলাম আপনার ইউনিয়নের অন্য পরিবারগুলো কোথায় আপনি জানেন? তিনি বললেন, 'বন্যার সময় কে কোথায় কীভাবে চলে গেছে

XvKvi dUcv_,‡jv‡Z Gfv‡e M‡o D‡V‡Q Avkq nviv gvb‡li msmvi

আমি জানি না। তবে পরে দেখেছি বেশির ভাগ পরিবার বাঁধে আশ্রয় নিয়েছে। কেউ কেউ আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে চলে গেছে। কিন্তু এখন তারা ফিরতে শুরু করেছে।'

সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসক মোঃ ইবাদত আলী ২০০০কে জানিয়েছেন বন্যার সময়ে বেড়িবাঁধ, রাস্তা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৬২টি আশ্রয় কেন্দ্রে প্রায় ৬৭ হাজার বানভাসি মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল। এদের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যারা আশ্রয় নিয়েছিল তারা চলে গেছে।

পাকা রাস্তার ৭০ ভাগ এবং বেড়িবাঁধে আশ্রয় নেয়া ৪০ ভাগ পরিবার ফিরে গেছে, বাকিরা এখনো আছে। এখন যারা আছে তারা পুনর্বাসন ছাড়া যাবে না। তাদের যাওয়ার জায়গাও নেই।

> বন্যাকালীন এই ত্রাণই আশ্রয়হারা মানুষগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। বন্যায় পানি নেমে যাওয়ার পর ত্রাণ আসা কমে গেছে। সরকারি ভিজিএফ এখনো চালু হয়নি। ফলে আশ্রয়হারা মানুষ বেঁচে থাকার জন্য যে যেভাবে পারছে কিছু আয় রোজগার করতে নেমে পড়ছে।

সিরাজগঞ্জের মতো প্রায় একই অবস্থা বগুড়ার ধুনটে। ধুনটের ঘোষাইবাড়ি, ভান্ডারবাড়ি অংশে বাঁধ ভেঙেছিল। ফলে ক্ষতি হয়েছে বেশি এই দু' ইউনিয়নের। ঘোষাইবাড়ি হাইস্কুলের আশ্রয়কেন্দ্রে বন্যার সময়ে শতাধিক পরিবার আশ্রয় নিয়েছিল। বন্যা শেষ হওয়ার পর স্কুলে ক্লাস শুরু হওয়ায় এদের বের করে দেয়া হয়েছে। এই পরিবারগুলো বিভিন্ন রাস্তার ধারে যে যেখানে জায়গা পেয়েছে আশ্রয় নিয়েছে।

এছাড়া ভান্ডারবাড়ি এবং ঘোষাইবাড়ি ইউনিয়নের বেড়িবাঁধে আশ্রয়ে নিয়েছে অসংখ্য পরিবার।

পানি উন্নয়ন বোর্ড বগুড়ার নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ সাইদুর রহমান সাপ্তাহিক ২০০০কে জানিয়েছেন, 'শুধু ধুনট উপজেলায় সাড়ে ৪ হাজার আশ্রয়হীন পরিবার আছে বাঁধের ওপর। আর পুরো জেলার ১৫ হাজার পরিবার বাঁধের ওপর বসবাস করছে।' অবশ্য এদের মধ্যে বেশির ভাগই সাম্প্রতিক বন্যার আগে থেকেই বাঁধে ছিল। এদের বসতবাড়ি বিভিন্ন সময়ে যমুনা ভেঙে নিয়ে গেছে। তাই এরা ভূমিহীন হয়ে পড়েছে এবং বাধ্য হয়ে বাঁধে আশ্রয় নিয়েছে।

ঘোষাইবাড়ি হাইস্কুলের পাশের একটি খুপরি ঘরে আছে নূরজাহান। বয়স ৩০/৩২-এর বেশি হবে না। তার বাড়ি ছিল মাস্টারপাড়ায়। বন্যা তার বাড়ি ভেঙে নিয়ে গেছে। তার বাড়ি যেখানে ছিল এখন সেখানে খাল। বাড়ি ভেঙে যাওয়ার পর আশ্রয় নিয়েছিল ঘোষাইবাড়ি হাইস্কুলে। স্বামী চট্টগ্রামে কাজ করে। বন্যার পরে সে আর আসেনি। তাই ৭ বছরের মেয়ে ময়নাকে নিয়ে তার শুরু হয়েছে এক দুর্বিষহ জীবন। কাজ নেই, পেটে ভাত নেই। তার ওপর বখাটেদের উৎপাত।

বৃদ্ধা সিরাতুন খাতুনের দুর্ভোগও কম নয়। তার বাড়ি ছিল শিমুলবাড়িতে। শিমুলবাড়ি গ্রামটি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এরপর কে কোথায় গেছে তিনি জানেন না। প্রথমে স্কুলঘরে ২২ দিন থাকার পর সেখান থেকে বের করে দিয়েছে তার ৬ সদস্যের পরিবারটিকে। সিরাতুনের বৃদ্ধস্বামী নজমত আলী চোখে দেখেন না। কাজ করতে পারেন না। অনাহারে-অর্ধাহারে গড়িয়ে যাচ্ছে তাদের দিন।

DP iv¯v Avi wk¶v cwZôvbB n‡qwQj evbfvmx‡`i Avkq¯j

বন্যার সময়ে দু'একটি এনজিও এবং রাজনৈতিক দল চাল এবং রান্না করা খাবার দিয়েছিল এখন তাও নেই।

বন্যার পানির চাপে বাঁধ ভেঙে লন্ডভন্ড যমুনা পাড়ের ৩টি জেলার আশ্রয়হারা মানুষের অবস্থা দেখার জন্য আমরা গিয়েলাম। এর মধ্যে ক্ষতি বেশি হয়েছে সিরাজগঞ্জ এবং বগুড়ায়। তুলনামূলক ক্ষতি কম হয়েছে জামালপুরে। তারপরও জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলার প্রায় ১০টি গ্রামের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। হরিণচরা, বেলগাছা, শান্তিনগর, বীরনন্দপাড়া, ফকিরা পাড়া, নয়াপাড়া,

রায়ের পাড়া প্রভৃতি গ্রামগুলোর বেশির ভাগ পরিবার তাদের বাড়িঘর হারিয়েছে। বন্যা পরবর্তী সময় এদের অনেকেই আবার আগের জায়গায় ফিরতে পেরেছে।

জামালপুর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হুমায়ুন কবিরের দেয়া তথ্যমতে, 'এবারের বন্যায় প্রায় ২ লাখ ৬৪ হাজার পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে'

বগুড়া, সিরাজগঞ্জের মতো খোদ রাজধানী শহর ঢাকার বিভিন্ন ফুটপাতে এখনো খুপরি ঘর করে আছে বন্যায় আশ্রয়হারা অসংখ্য পরিবার। অভিজাত বাণিজ্যিক এরিয়া পান্থপথ, খিলগাঁওয়ের বিভিন্ন রাস্তা এবং বিশ্বরোডের বিভিন্ন স্থানে পলিথিন মোড়ানো খুপরি ঘর চোখে পড়ে। কমলাপুরে নবনির্মিত বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা স্টেডিয়ামে দোকানের জন্য তৈরিকৃত কক্ষগুলো এখন ৫০/৬০টি আশ্রয়হারা পরিবারের আবাসস্থল।

বৃদ্ধ আহসান উল্লাহ তার পরিবার পরিজন নিয়ে এই স্টেডিয়ামে আশ্রয় নিয়েছেন প্রায় দেড় মাস। নিজের বয়স ৫৩'র বেশি হলেও তার ছোট মেয়ের বয়স মাত্র আড়াই বছর। আহসান উল্লাহ ঘর্মাক্ত শরীরে জোরে পাখা চালাচ্ছে। গিন্নি রান্না করছে মাটির চুলায়। তার পাশেই তিনটি শিশু মশারির নিচে খেলছে।

মানিক নগরের রিনা খাতুন এখানে আছেন এক মাসের বেশি হল। রিনার স্বামী আবুল কালাম ৪ বছর ধরে যক্ষায় ভুগছে। সে কোনো কাজ করতে পারে না। রিনা বাসায় বাসায় কাজ করে অসুস্থ স্বামী, বুড়ো শাশুড়ি এবং মেয়ের মুখের খাবার জোগানের চেষ্টা করে। কিন্তু পেরে ওঠে না। প্রায়ই এই পরিবারটিকে উপোস থাকতে হয়। এই কষ্টের ভেতরে বন্যার পানি এসে আবার দুঃখের সংসারটিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। দুই অসুস্থ মানুষ এবং শিশু কন্যাকে নিয়ে রিনা এসে উঠেছেন এই স্টেডিয়ামে। এখান থেকে নামিয়ে দিলে কোথায় যাবেন রিনা জানেন না।

এখানে আশ্রয় নেয়ার পর রিনা দু দফায় ৩ কেজি করে ৬ কেজি চাল পেয়েছেন। এই ত্রাণ কে বা কারা দিয়েছে রিনা জানেন না।

মালিবাগ চৌধুরীপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বন্যার সময়ে আশ্রয় নিয়েছিল কয়েক হাজার মানুষ। এদের মধ্যে হাফিজার পরিবারও ছিল। সম্প্রতি তাদের স্কুল থেকে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন তার পরিবার আশ্রয় নিয়েছে ফুটপাতে। বন্যার আগে হাফিজা খিলগাঁওয়ের ব্যাংকের বাড়ির ঝিলপাড়ে ছিল। এলাকাটি নিচু বিধায় সেখানের পানি পুরোপুরি এখনো নামেনি। এভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে হাজার হাজার বন্যায় আশ্রয়হারা পরিবার মানবেতর দিন কাটাচ্ছে। এরা বুঝতে পারছে না কোথায় যাবে। এদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারের কোনো তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না।

নানারকম প্রাকৃতিক দুর্যোগে দেশে প্রতিবছর অসংখ্য পরিবার বসতবাড়ি হারায়, হারায় চাষের জমি। এরপর শুরু হয় এদের দুঃখ-কষ্টের জীবন। ধানক্ষেতে নানা রকম পোকা মাকড় বাস করে। বর্ষার সময় যখন ক্ষেতে পানি বেড়ে যায় তখন এরা ছোটে জীবন বাঁচানোর জন্য উঁচু জায়গার সন্ধানে।

বাংলাদেশের বন্যা উপদ্রুত এলাকার মানুষগুলোর জীবন যেন পোকামাকড়ের চেয়ে নিকৃষ্ট। বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর পোকামাকড় তার পুরনো জায়গায় হয়তো ফিরতে পারে অথবা অন্য কোনো আবাস গড়তে পারে। বন্যায় আশ্রয়হারা মানুষ অনেক সময়েই তার পুরনো জায়গায় ফিরতে পারে না। বন্যার পানি এবং বন্যাপরবর্তী নদী ভাঙনে হারিয়ে যায় গ্রামের পর গ্রাম। যেমনটি এবছর হয়েছে যমুনা তীরবর্তী বগুড়া এবং সিরাজগঞ্জের হাজার হাজার পরিবারের ক্ষেত্রে। চরম অনিশ্চিত এই জীবনে একটু স্বস্তি এনে দেয়ার জন্য আমাদের সমাজপতি এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের কী কিছুই করার নেই!

বাংলাদেশের বন্যা উপদ্রুত এলাকার মানুষগুলোর জীবন যেন পোকামাকড়ের চেয়ে নিকৃষ্ট। বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর পোকামাকড় তার পুরনো জায়গায় হয়তো ফিরতে পারে অথবা অন্য কোনো আবাস গড়তে পারে। বন্যায় আশ্রয়হারা মানুষ অনেক সময়েই তার পুরনো জায়গায় ফিরতে পারে না।

ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**

রিপোর্টটি তৈরি হয়েছে
হিউমেনিটেরিয়ান এইড অফিস ও অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের সহায়তায়